মাহিন মাহমুদ

একটি লাল নোটবুক

©
প্রকাশক
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

একটি লাল নোটবুক

মাহিন মাহমুদ

মাকতাবাতুল হাসান

একটি লাল নোটবুক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রি.
সর্বশেষ মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
প্রচ্ছদ : হিমেল হক
অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com - quickkcart.com - wafilife.com
পরিবেশক :
ISBN : 978-984-8012-04-8
Web : maktabatulhasan.com
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com
fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ২৪০/- টাকা মাত্র

Punnomoyi
By Mahin Mahmud
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

অর্পণ

প্রথম উপন্যাস 'আঁধার মানবী' প্রকাশিত হওয়ার পর আব্বা বইটি হাতে নিলেন। প্রথমেই উৎসর্গ পাতাটায় চোখ বোলালেন। দেখতে চাইলেন, কাকে উৎসর্গ করা হয়েছে... তাঁকে অথবা মা'কে করা হয়নি দেখে একটু কি মন খারাপ করলেন?

প্রিয় বাবা-মা, অযোগ্য ছেলের অসংখ্য ভুল ক্ষমা করে দিন!

'আমি কি এখানটায় বসতে পারি?'

মারুফ একপাশে সরে গিয়ে বলল, 'জ্বী, বসুন।'

'একটু যদি জানালার পাশের সিটটায় আমাকে দিতেন, ভালো হতো। দূরপাল্লার জার্নিতে আমার একটু সমস্যা হয়। বমি বমি লাগে।'

মারুফ ইতস্তত করল। বাসে জানালার পাশে না বসলে তারও সমস্যা হয়। মাথা ঘোরায়। পেটের ভেতরটা গুলিয়ে ওঠে। তা ছাড়া, বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় মা পইপই করে বলে দিয়েছেন, 'জানালার পাশের সিট ছাড়া বসবি না। হাত এবং মাথা জানালার বাইরে বের করবি না। ফেরিওয়ালাদের থেকে কোনো কিছু কিনে খাবি না, মনে থাকবে তো?'

'জ্বী মা, থাকবে।'

'শুধু ফেরিওয়ালা না, যাত্রীরা কেউ কিছু দিলেও খাবি না।'

'আচ্ছা।'

'টাকা-পয়সা সাবধানে রাখবি, কারও সামনে মানিব্যাগ খুলবি না, ভাড়ার টাকা আগেই আলাদা করে রাখ।'

'আচ্ছা মা, রাখব।'

'রাখব না, এখনই আলাদা কর।'

'এই, করলাম।'

'মন দিয়ে পড়াশোনা করবি। পড়াশোনা ছাড়া আর কোনো কিছুতে মনোযোগ দিবি না। জানি তুই আমার তেমন ছেলেই না, তবুও, দেশের পরিস্থিতি ভালো না, তাই বললাম। সময়মতো ঘুম, গোসল, খাওয়া-দাওয়া করবি, কেমন?'

'জ্বী আচ্ছা, করব মা।'

'এইবার যা বাবা। ফী আমানিল্লাহ... আর শোন!'

মারুফ হেসে ফেলে বলল, মা, দেরি হয়ে যাচ্ছে! গাড়ি পাব না শেষে!'

মনোয়ারা ভেজা চোখে ছেলেকে বাড়ির সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, ঢাকায় গিয়েই মাকে ফোন করবি, মনে থাকবে তো?'

'জ্বী, থাকবে।'

মারুফের সবই মনে আছে। কিন্তু বুঝতে পারছে না এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত। সে কি জানালার পাশের সিটটা ছেড়ে দেবে, নাকি ঝিম মেরে বসে থাকবে। নাকি বলেই ফেলবে, আমি জানালার পাশের সিট ছাড়তে পারব না, আপনি এই সিটেই বসুন।

'কিছু বলছেন না যে?'

মেয়েটা সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মারুফের পক্ষে ঝিম মেরে বসে থাকা সম্ভব হলো না। সে এতটা স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন না যে, কেউ তার কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য করবে না। তার এই পঁচিশ বছর বয়সেও মা এখনো তাকে যতই বোকাসোকা এবং ছেলেমানুষ ভাবুক, এই ভদ্রতাবোধটুকু তার আছে। সিটটা ছেড়ে দেয়াই উচিত। কয়েক ঘণ্টারই তো জার্নি। একটু না হয় মাথা ঘোরালো, পেট গুলাল ক্ষতি কি তাতে? অন্য একজনের উপকার তো হচ্ছে!

মারুফ জানালার পাশের সিটটা ছেড়ে দিয়ে সরে বসল। মেয়েটা একরাশ কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ'।

ফরমালিটিবশত মারুফের বলা উচিত—না, ঠিক আছে, ওয়েলকাম। কিন্তু সেটা সে বলতে পারছে না। এ ব্যাপারে মারুফ বরাবরই বিফল। ফরমালিটিটা তাকে দিয়ে হয় না। কেমন যেন জড়তা কাজ করে। মেয়েদের সামনে তো আরও বেশি। জড়তা যেন অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে!

মেয়েটা জানালাটা ভালো করে খুলে দিয়ে আরাম করে বসল। ক্লান্ত হাতে ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে পানি খেল। এরপর বলল, 'আপনি ঢাকায় কোথায় যাবেন? সিলেটে থাকেন কোথায়?'

মারুফের অক্টোপাসটা চারপাশে ঘুর ঘুর করছে। এখন আছে আঁকড়ে ধরবে টাইপ অবস্থায়। 'আপনি কি মাদ্রাসায় পড়েন?'

মারুফের দৃষ্টি সামনের রাস্তার দিকে। সে দৃষ্টিটা বড়জোর রাস্তা থেকে সরিয়ে ড্রাইভারের মাথা পর্যন্ত আনতে পারল। ছোট্ট শব্দে বলল, 'জ্বী।'

'আপনি এভাবে শক্ত হয়ে বসে আছেন কেন? স্বাভাবিক হয়ে বসুন! আমি কি আপনাকে অসুবিধায় ফেলে দিলাম?'

'অসুবিধায় ফেলবেন কেন? দুটি সিটের একটা তো খালিই ছিল। কাউকে না-কাউকে বসতেই হতো। আপনি বসেছেন, এতে অসুবিধার কী আছে?'

কথাটা মারুফ সশব্দে বলেনি। সশব্দে বলতে পারলে তো হয়েই যেত। বলেছে নিঃশব্দে, মনে মনে। 'আপনি কি বিব্রতবোধ করছেন? কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে?'

এই কথায় মারুফ আরও জড়সড় হয়ে গেল। মেজাজ খারাপও হলো কিছুটা। মেয়েটা একটার পর একটা প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। এত কথা বলার কী দরকার? চুপচাপ বসে থাকলে কী হয়? এই জন্যই বুঝি বন্ধুরা বলে, মেয়েদের পক্ষে চুপচাপ থাকা, আর আগুনে হাত রাখা সমান কষ্টের।

২

মারুফ এই মুহূর্তে একটা মোবাইল ফোনের অভাব অনুভব করছে। মোবাইল ফোন থাকলে ভালো হতো। হেডফোন কানে গুঁজে দিয়ে তিলাওয়াত শোনা যেত। এতে লাভ হতো দুটি। নিজেকে স্বাভাবিকও করা যেত, আবার মেয়েটার কথাও কানে নিতে হতো না। তা ছাড়া, আমলনামায় সওয়াব যোগ হওয়ার বিষয়টা তো আছেই।

মারুফের মোবাইল ফোন যে নেই তা নয়; আছে। বড় মামা সৌদি থেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সেটা ব্যবহার করা হয় বাড়িতে এলে, কালে-ভদ্রে। মোবাইলের পেছনে পড়ে থাকলে পড়াশোনার ক্ষতি হবে ভেবে সেটা কখনোই মাদ্রাসায় নেয়া হয় না।

এই যুগের এক যুবক ছেলের হাতে মোবাইল ফোন নেই, বিষয়টা একটু অবাক করার মতোই। বাড়িতে গেলে পরিচিত অনেকেই ফোন নম্বর জানতে চায়। মারুফ ইচ্ছে করেই নম্বর দেয় না। দিয়ে লাভ কী? কদিনই-বা বাড়িতে থাকা হয় তার?

পাড়ার সমবয়সীরা ব্যাকডেটেট, বুরবাক বলে খ্যাপায়। মারুফ এসব গায়ে মাখে না। ওর কাছে পড়াশোনাটাই সব। কে কী বলল তাতে ওর কিচ্ছু যায় আসে না।

মেয়েটা পার্স থেকে ফোন বের করে কাকে যেন ফোন করল। প্রায় ফিসফিস শব্দে কথা বললেও কিছু কিছু কথা বোঝা যাচ্ছে। 'ভাবি! আমি নাবিলা বলছি, আমার কণ্ঠ চিনতে পারছ না?... হ্যাঁ হ্যাঁ! এই তো অনেকক্ষণ হয়েছে গাড়িতে উঠেছি।... জানো ভাবি! জানালার পাশে সিট পাচ্ছিলাম না, একজন মহানুভব ব্যক্তি তার সিট আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।... নাহ্, কী বলছ?... ছেলেটাকে মোটেও বাজে লোক বলে মনে হচ্ছে না। তবে, একটু লাজুক টাইপের। মাদ্রাসার ছাত্ররা তো!'...

মেয়েটা এই কথাগুলো বলে এরপর কী নিয়ে যেন মৃদু হাসল। হয়তো মারুফকে নিয়েই হেসেছে। ওর ভোলাভালা স্বভাবের জন্য সবাই যেখানে হাসি-ঠাট্টা করে, এই মেয়েই-বা ছেড়ে কথা বলবে কেন?

জীবনটা জটিল আবার সরলও। জীবনটাকে একেকজন একেকভাবে উপভোগ করে। মারুফ সরলতাটাকেই বেছে নিয়েছে। কেউ যদি এর জন্য বোকা ভাবে, ভাবুক না।

৩

জাহিদ চরম বিরক্ত। একটা কাজও ঠিকমতো হচ্ছে না। কিছুদিন পর বিশ্ব ইজতেমা। ইজতেমা উপলক্ষে মাদ্রাসা ছুটি থাকবে পুরো তিন দিন। দূর-দূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মুসল্লি ছুটে আসবে ইজতেমার এই মিলনমেলায়। মারুফ ও জাহিদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবারের ইজতেমায় আসা আল্লাহর মেহমানদের বিনামূল্যে পানি, স্যালাইন এবং খেজুর দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে। তিন দিনই চলবে এই আপ্যায়নসেবা। সেই লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহও হয়ে গিয়েছে।

এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল, কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায়। দাওরায়ে হাদীস জামাতের ছাত্ররা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 'চোখে আঙুল' নামে একটা বইও বিতরণ করা হবে। বইটিতে তাবলীগ নিয়ে অপপ্রচারের জবাব, দলিলসহকারে তুলে ধরা হবে। বইটির প্রুফ দেখছিল মারুফ। মাদ্রাসার লাইব্রেরি রুমের কম্পিউটারে সেটা সেভ করে রেখেছে সে। পাসওয়ার্ডও তারই কাছে। সুতরাং এই সময়ে তার উপস্থিতি খুবই প্রয়োজন। জাহিদ বলল, 'এই মাসুদ! মারুফ কখন আসবে, জানিস কিছু?'

মাসুদ হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'নাহ, জানি না কিছুই। ওকে ছাড়া তো কোনোভাবেই হচ্ছে না বন্ধু! ওই ব্যাটা এমন একটা জিনিস! সঙ্গে ফোনও রাখে না। কখন আসবে, কোথায় আছে সেই খবরটাও নিতে পারছি না। এখন কী হবে বল তো?'

মারুফকে ছাড়া কিছু যে হবে না, এটা জাহিদ ভালো করেই জানে। শুধু জাহিদ কেন, মারুফ একজন প্রতিভাবান ছেলে, এই সত্যি কথাটা সবারই জানা। পড়াশোনার পাশাপাশি দ্বীনের অনেক খেদমত সে এখনই শুরু করে দিয়েছে। যেমন, গত বছর। রমজানের ছুটির পর মারুফ বলল, 'ছুটিতে এবার আর বাড়ি যাব না।'

জাহিদ অবাক গলায় জানতে চাইল, 'কেন? বাড়ি কেন যাবি না?'

'রমজানের এই লম্বা ছুটিতে তাবলীগে সময় লাগাব। সফর করব। সফর করলে অনেক কিছু শেখা যায়। সাধারণ মানুষদের করুণ অবস্থাও কিছু কিছু অনুভব করা যায়। তুইও চল, আমার সঙ্গে।'

'আমিও?'

'হুঁ। তুইও।'

প্রিয় বন্ধুর আবদার বলে কথা। জাহিদ না করতে পারল না। কাকরাইল মসজিদ থেকে ওদের জামাতের রোখ হলো রংপুরে। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, লোকজন নামাজ-রোজা ভুলে কোন এক ভণ্ড পীরের পাগলামির শিকারে পরিণত হয়ে বসে আছে।

লোকগুলো পীর বাবার প্রতি এতটাই দিওয়ানা হয়ে আছে, বাবা যদি ভরদুপুরেও বলে, 'আহা! আকাশে কত তারকা!'

মুরিদরাও বলে, 'আহা! যেন ফুল ফুটে আছে!'

ঘুটঘুটে আঁধার রাতেও যদি পীর বাবা বলেন, 'ওরে দেখেছিস, সূর্যের কী দীপ্তি!'

মুরিদসকল বলে ওঠে, 'আহা! হুজুরের কী দিব্যদৃষ্টি!'

পীর বাবা বলেছেন, 'লোকেরা বলে, আল্লাহর ঘরে নামাজ পড়ে এলাম। কী হাস্যকর কথা! মসজিদ আবার আল্লাহর ঘর হয় ক্যামনে? নিজেরা বানাইয়া কয়, ঘরটা আল্লাহর। এখানে কি নামাজ হবে? নিজের ঘরে বসে পীরের ধ্যান করো, নামাজ এমনিতেই হয়ে যাবে।'

পীরসাহেবের এই এক কথায় এলাকার পুরুষেরা মসজিদে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এদের কেউ বোঝায়নি, পবিত্র কাবা ঘরও হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বানানো। তিনি একজন মানুষই ছিলেন।

পীর বাবা একদিন বললেন, 'তোমরা যেই কোরআন পড়ো, এইটা তো পাতায় ছাপানো জিনিস। দিলের কোরআনই হইল আসল।'

এই কথায় মা-বোনেরা পবিত্র কুরআন পড়া ছেড়ে দিয়েছে। এদের কে বোঝাবে, এই কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকেই পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আসছে!

বিকেলবেলা গাশতে গিয়ে, পীর-মুরিদদের বিষয়ে এমন অনেক কিছু জানা গেল। এদের কাছে পীর বাবাই সব, বাকি সব মিথ্যে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ একজনকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'দাদু! আপনি কি জানেন, আমাদের নবী কে?'

দাদু ঘোলা চোখে পিটপিট করে তাকিয়ে বললেন, 'আগে তো আয়ুব খান আছিল, অহন কে কী জানি!'

জাহিদ হেসে উঠল। মারুফ বলল, 'হাসছিস কেন?'

'হাসব না? দাদুর অবস্থা দেখেছিস?'

'এর জন্য আমরাই দায়ী।'

'কী রকম?'

'গাঁও-গেরামের লোকেরা এমন অনেক কিছুই জানে না। নবীর নাম তো অনে দূরের বিষয়, খবর নিয়ে দেখ! এরা সূরা-কেরাত, অজু-গোসল, নামাজ-রোজা কিছু ঠিকমতো জানে না।'

'তো? এতে আমরা দায়ী হলাম কীভাবে?'

'এদের হাতে-কলমে শেখানোর দায়িত্ব আমাদেরই ছিল। আমরা আগে থেকে তাদের খোঁজ নিতে পারিনি। এদের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে, এসব ভণ্ডরা। সুযোগ বুঝে টু-পাইস কামিয়ে নিচ্ছে। এখন তুইই বল, এসব সহজ-সরল লোকগুলোকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে ফেরাতে আমাদের কত বেশি চেষ্টা করা দরকার!

জাহিদ বিষয়টা অনুধাবন করে বলল, 'ঠিকই বলেছিস বন্ধু। আমরাই দায়ী। শহরের আয়েশ ছেড়ে, অজপাড়াগাঁয়ের এই মানুষগুলোর কাছে আসার কথা তো আমাদের মনেই পড়ে না!

৪

ইচ্ছেটা পূরণ হলো না রেহানের। তার অনেক দিনের ইচ্ছে, জার্মানিতে যাবে। এই লক্ষ্যেই সে নিয়মিত ব্লগে লিখে যাচ্ছিল। ঠিক লিখছিল বলা যাবে না, সে একজন কার্টুনিস্ট। ভালো কার্টুন আঁকতে পারতো। মজাদার কার্টুন। মজার মজার কার্টুন সে তার ব্লগে আপলোড দিত। নামও কামিয়েছিল বেশ! তবে সে তার এই মেধাটা যে কাজে খাটাচ্ছিল, তার নাম ধর্মবিরোধিতা।

জগতের অনেক মানুষই সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত অসীম মেধা নিয়ে জন্মায়। কেউ মেধাটাকে খাটায় ভালো কাজে, কেউ-বা আবার এর উল্টোটায়। হিটলারেরও মেধা ছিল। কিন্তু সে তার মেধাকে খাটিয়েছে মানুষ ধ্বংসের কাজে। তার খুব নাম হয়েছে। তবে, সুনাম নয়; দুর্নাম। মানুষ তাকে চিরদিন মনে রেখেছে, এবং রাখবেও। তবে সেটা একজন মন্দ, অত্যাচারী এবং স্বৈরাচারী হিসেবে।

রেহানের নাম কামানোর চেষ্টাটাও এই পর্যায়েরই। সে মুসলমানদের কৃষ্টি-কালচার এবং নবীজির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন এঁকে জার্মান ধর্মহীনদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে যাচ্ছিল। হিটলারও জার্মান একনায়ক ছিল। ন্যায়-অন্যায় নিয়ে ভাবেনি। রেহানও ন্যায়-অন্যায় নিয়ে ভাবত না। তার একটাই ভাবনা—অ্যাসাইলাম পেয়ে তাকেও জার্মানিতে যেতে হবে। অল্প সময়ে, বিনা খরচে জার্মানির বিলাসবহুল জীবনযাপনের

এইটাই রাস্তা। এই পর্যন্ত তার যেসব পূর্বসূরিরা জার্মানিতে গিয়েছে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই গিয়েছে। রেহানই-বা পিছিয়ে থাকবে কেন?

হাবিব সাহেব রেহানের বাবা। অসুস্থ মানুষ। বিছানা না নিলেও, নেব নেব করছিলেন। মানুষটা বিপত্নীক। তার স্ত্রী সুলতানা গত হয়েছেন মাস দুয়েক হলো। রেহানকে নিয়ে সুলতানাও বেশ চিন্তিত ছিলেন। ছেলে কোনো কাজকর্ম করে না, গ্র্যাজুয়েশন করেও বেকার ঘরে বসে আছে। সারাক্ষণ কম্পিউটারে কী সব হাবিজাবি কার্টুন আঁকে, আর বলে, 'এ তো কার্টুন না মা! আমাদের বড়লোক হবার সিঁড়ি!'

সুলতানা কপাল কুঁচকে বলতেন, কী সব আবোল-তাবোল বলিস এগুলো? কার্টুন আবার বড়লোক হবার সিঁড়ি হয় কী করে?

'ও তুমি বুঝবে না মা। যখন হব তখন দেখে নিয়ো।'

ছেলের কথা শুনে হাবিব সাহেবও রেগে গিয়েছিলেন। রেগে গিয়ে বললেন, 'বিখ্যাত কার্টুনিস্টরাই আজকাল ঘাস কেটে খাচ্ছে! আর উনি বসে আছেন বড়লোক হবার আশায়। এসব ধানাই-পানাই আমার সংসারে চলবে না। চাকরি-বাকরি খোঁজো। না হয় ঘর ছাড়ো। আমার ঘরে কোনো কার্টুনিস্ট ফার্টুনিস্টের জায়গা নেই।'

রেহান কারও কথা কানে নেয়নি। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষিত এই ছেলেটা আদব-কায়দারও ধার ধারেনি। 'বাপ-মা'র মুখের ওপর বলে দিয়েছে, 'আমি কার্টুন এঁকেই দিন কাটাব। তোমাদের যা ইচ্ছা কোরো।'

হাবিব সাহেব কিংবা সুলতানা বেগম আর কোনো উচ্চবাচ্যের ভেতর দিয়ে যাননি। রেহান তাদের একমাত্র ছেলে। বড় আদরের। তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া তো দূরে থাক, এই কথা চিন্তাও করতে পারেন না। এভাবেই চলছিল। যতই দিন যাচ্ছিল, ধর্মহীনদের কাছে রেহানের আঁকা কার্টুনের জনপ্রিয়তা ততই যেন বাড়ছিল।

৫

এক মাস আগের এক ঘটনা। রেহান সেদিন মহা আনন্দিত ছিল। তার আঁকা কার্টুনে সেদিন প্রচুর লাইক পড়েছিল। কমেন্টসও এসেছিল অনেক। দুজন শেয়ারও করেছে। কমেন্টসগুলোর মধ্যে দু-একটা উৎসাহমূলক হলেও, তার আঁকা কার্টুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই করেছে বেশি মানুষ। পাগল, খোদার দুশমন, বদ্ধ উন্মাদ—এসব বলে গালাগালও দিয়েছে অনেকেই।